Anusandhanvallari
Vol 2020, No.1
February 2020
ISSN 2229-3388

Different Aspects of Bengali Short Stories: An Overview

Dr. Rahul Das

Department of Bengali,

Assam University

সাহিত্যের বহুমুখী শাখা প্রশাখায় পল্লবিত পত্র মর্মরে 'ছোটগল্প' নামক নব প্রস্ফুটিত কুসুমের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তাই ছোটগল্পকে বলা যায় আধুনিক কালের ফসল। মধ্যযুগীয় কল্পলোকের কাহিনী নয়, মাটির পৃথিবীর বাস্তব জীবনের হাসি কান্না, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংঘর্ষ, মুক্তির ব্যাকুলতা ও আত্ম প্রতিষ্ঠার বাসনার এক শিল্প সম্মত রূপ হচ্ছে আজকের এই 'ছোটগল্প'। ছোটগল্পের রূপ বৈচিত্র্য ও ধরণ ধারণ স্বতন্ত্র। তাই আজ পর্যন্ত ছোটগল্পের সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হয়নি। এইচ জি ওয়েল্স ছোটগল্পের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন-

''A Short story is, or should be, a simple thing, it aims at producing one single vivid effect, it has to size the attention at the onset, and never releasing, gather it together more and more until the climax is reached. The limits of human capacity to attend closely therefore set a limit to it, it must explode and finish before interruption occurs or fatigue sets in.''[১]

ভারতবর্ষকে গল্প সাহিত্যের আদিভূমি বলা হলেও আধুনিক ছোটগল্পের জন্মঅবশ্য প্রতীচ্যে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফরাসী সাহিত্যে যখন রোমান্টিক যুগ বিরাজ করছিল,সেই সময়টাতে প্রসপার মেরিমে গল্প লেখক হিসেবে বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, কেননা তাঁর হাতেই ফরাসী গল্পের একটা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ রূপ সর্বপ্রথম ধরা দেয়। কিছুকাল পরেই ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের অবসান ঘটিয়ে ধরা দিল রিয়েলিজমের সুর। রিয়েলিজমের জনয়িতা ছিলেন গুস্তেব ফ্লরের। এই ফ্লবেরের প্রিয় শিষ্য মোপাসাঁর হাতে ফরাসী ছোটগল্প এক বিশেষ বিশিষ্টতা অর্জন করলো। বিশ্ব সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক হিসেবে চিহ্নিত মোপাসাঁ এক তীব্রোজ্জ্বল আয়রনি ও অপ্রসন্ন জীবন যন্ত্রণার দুঃখবাদকে সাহিত্যে ঢেলে দিয়ে রচনা করলেন অজস্র ছোটগল্প। পরাজিত ফরাসীর রক্তাক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা এবং উচ্চতর সমাজের প্রতি অসহ্য ঘৃণা নিয়ে মোপাসাঁ রচনা করলেন তাঁর প্রথম গল্প 'ব্যুল দ্য সুইফ' বা 'চর্বির গোলা'। দশ বছরের সময় সীমায় তিনি রচনা করলেন প্রায় তিনশোটি গল্প । এই গল্পগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক নীতিহীনতা, আত্মিক পরাভব ও ব্যাধিগ্রস্ত সময়ের রূপচিত্র। আধুনিক ছোটগল্পের ইতিহাসে তাই মোপাসাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। পরবর্তীতে আনাতোল ফ্রাঁস, আন্দ্রে জিদ, মার্সেল প্রুস্ত, জাঁ-পল-সার্ত্র, আলবের ক্যামু প্রমুখ কথাসাহিত্যিকরা শুধু ফরাসী নয়, সমগ্র বিশ্বের ছোটগল্পকে পৌঁছে দিলেন আধুনিকতার চারণভূমিতে। তবে ছোটগল্পের ইতিহাসে মোপাসাঁর যথার্থ উত্তরসূরী হয়ে দেখা দিলেন আন্তন চেকভ। তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে জারশাসিত রাশিয়ার এক বিশেষ যুগসঙ্কটের বীভৎস ছবি। শুধুমাত্র জগতেরই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষণদীপ্ত মুহূর্ত ও রূপের পশ্চাদপটে তিনি খুঁজে পেয়েছেন ভিন্নতর অর্থ। এই উপলব্ধিকে তিনি কথা সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন গল্পের

অবয়বে। চেকভ হচ্ছেন সেই শিল্পী যার হাতের ছোঁয়ায় অতি সাধারণও অসাধারণত্বের গৌরব অর্জন করতে পারে। জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন স্রোতস্বিনীর চলমান তরঙ্গ, যা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে অন্তহীন সমুদ্রের কাছাকাছি।

'সাহিত্যে ছোটগল্প' নামক গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চেকভ ও মোপাসাঁর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

"মোপাসাঁর সম্পদ বৈচিত্র্যে, চেকভের মহিমা গভীরতায়; মোপাসাঁ গল্প আবিষ্কার করেছেন- চেকভের কাছে গল্প উদ্ভাসিত হয়েছে, একজনের কাছে জীবন Exposure, আর একজনের কাছে Revelation ; মোপাসাঁর গল্পে উদ্দাম বিস্ফোরণ-চেকভের গল্পে প্রশান্ত উন্মীলন।"[২]

মোপাসাঁ এবং চেকভ দুজনে সমসাময়িক হলেও ফ্রান্স এবং রুশিয়ার সমাজ জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। হতাশা এবং পরাজয়বাদের যে ঘনযামিনীর তিমিরে নিমজ্জিত হয়ে মোপাসাঁর বুদ্ধিজীবি মন নিষ্ফল হাহাকারে আর্তনাদ করে উঠেছে, চেকভের মধ্যে সেই নিষ্ফল কান্না ধ্বনিত হয় না। কেননা চেকভের দৃষ্টি পথে বিফল বিপ্লবের কোন রিক্ততার ছায়া ধরা দেয়নি, বরং তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সম্ভাব্য বিপ্লবের পূর্বাভাস। রুশিয়ার অবক্ষয়িত সমাজতন্ত্র, বুদ্ধিজীবি মনের দোলাচলতা ও আশাবাদ, কৃষিশ্রেণীর নির্মম শোষণ যেমন তীক্ষ্ণতায় তাঁর রচনায় বর্ণিত হয়েছে, তেমনি মানুষের মুক্তি, পবিত্রতা ও শুভচেতনায়ও তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

ইংরেজি সাহিত্যে চসার তাঁর 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস্'-এর মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের বীজ বপন করলেও রবার্ট লুই স্টিভেনসনকেই ইংরাজি সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। তবে ইংল্যান্ডের ছোটগল্প প্রথম মহা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় গল্প সাহিত্যের ধার কাছ ও ঘেঁষতে পারেনি। কেননা উনিশ শতকের পৃথিবীতে ইংরেজরাই ছিল সব চাইতে সুখী। ইংল্যান্ডের ভাগ্যভূমি তখন মধ্যাহ্ন সূর্যের সোনালি আভায় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সপ্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে সগৌরবে ভেসে বেড়াচ্ছিল তাদের বাণিজ্যতরী, আর বয়ে আনছিল পৃথিবীর ভান্ডার লুট করা রাশি রাশি সোনা। তাই তারা সমৃদ্ধি আর স্বাচ্ছন্দে পরিতৃপ্ত ছিল।

উনিশ শতকের ছোটগল্পে জার্মানের ও কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। প্রথমদিকে ততটা শিল্প সফলতা লাভ না করলেও উনিশ শতকের শেষের দিকে জার্মান ছোটগল্প অনেকটাই পূর্ণতা লাভ করেছে। জার্মান গল্পবিশ্বে তখন বিরাজ করছিলেন হারম্যান সুডারম্যান, আর্থার স্নিৎস্লার, জ্যাকব ভ্যাসারম্যান। এরপর আসলো টমাস ম্যান, স্টেফান এবং আর্নল্ড ৎসুইন, ফ্রান্স্ কাফকা ও পল হোসির গল্প।

সুডার ম্যানের রচনায় একদিকে যেমন লক্ষ্য করা যায় মোপাসাঁর গল্প রীতির প্রভাব, অন্যদিকে আবার দেখা যায় তা চেকভের পরিচ্ছন্নতায় মার্জিত। তাঁর'The New Year's Eve Confession' বা 'নববর্ষ দিনের স্বীকারোক্তি' একটি শিল্প সফল ছোটগল্পের উদাহরণ।

সাহিত্যের বিচারে ফ্রান্স, রুশিয়া এবং আমেরিকা এই তিনটি দেশেই মূলত ছোটগল্পের সফল ও সার্থক আত্মবিকাশ ঘটেছে, আর বাকি দেশগুলি তাতে সহযোগিতা করেছে।

মার্কিন ছোটগল্পে হথর্ণ এবং এডগার অ্যালান পো-র অবদান অনেকখানি। এই দু'জনকে অ্যামেরিকান ছোটগল্পের পথ প্রদর্শকও বলা যায়। মানসিক নিঃসঙ্গতা থেকেই দু'জনের যাত্রা শুরু হয়েছে। আত্মপ্রকাশের ব্যর্থতা ও মনোবেদনা নিয়ে চতুর্দিকে এক দুঃস্বপ্নের বেড়াজাল তৈরি করে পো রচনা করেছেন একের পর এক শিল্প সার্থক ছোটগল্প। তাঁর 'The Black Cat' বা 'কালো বেড়াল' পড়ে আজও লক্ষ লক্ষ পাঠক সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো বেড়াল দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। 'The Tell Tale Heart' বা 'জীবন্ত হৃদয়' গল্পের প্রতিটি স্পন্দন যেন নরক থেকে শয়তানের পদধ্বনির মতো উঠে আসে, 'The Fall of the House of Ushers' বা 'আশার বংশের পতন' গল্পে রোমাঞ্চকর মধ্য নিশিথে যখন কবরের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েটি দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ায়, তখন বক্তার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও চৈতন্যলুপ্তির উপক্রম ঘটে।

পো-র জীবন কাহিনী থেকে জানা যায় তিনি কখনো সহজ স্বাভাবিক জীবনের আস্বাদ পাননি। দরিদ্র অভিনেতা অভিনেত্রীর সন্তান পো পালক পিতা অ্যালানের কাছে বড় হয়েছেন, যিনি তাঁকে কখনো স্নেহের চোখে দেখেননি। যৌবনে চিররুগ্না স্ত্রী, দারিদ্র্য, হতাশা এবং অপরিমিত সুরাসক্তি নিয়ে তিনি মনো যন্ত্রণায় প্রেতগ্রস্তের মত দিন কাটিয়েছেন। তাই তাঁর নেশাগ্রস্ত বিষাদময় অনুভূতি থেকে সৃষ্টি করেছেন এই প্রেত পৃথিবী।

তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ছোটগল্পের কলারীতিকে পো একটি নির্দিষ্ট শৈল্পিকরূপ দিয়ে গেছেন। সীমিত পরিসরে একটি বিশেষ ঘটনাকে নির্বাচন করে, তার মধ্যে বাঞ্ছিত তাৎপর্য আরোপ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। পো-র সঙ্গে সঙ্গে অ্যামেরিকায় যেন ছোটগল্পের নব জাগরণ শুরু হল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত প্রায় ষাট বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন গল্প সাহিত্যের চর্চা চলতে থাকে সেখানে। আর এই কারণেই মার্কিনী ছোটগল্প পরিপূর্ণ শৈল্পিক সিদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতবর্ষেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা ছোটগল্পের পথ চলা শুরু হয়। প্রথমদিকে ইংরেজির প্রভাবে উপাখ্যান জাতীয় গল্প লেখার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়।'Novella' পর্যায়ের 'ঐতিহাসিক কাহিনী'তে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এর সূচনা করেন। শিল্প সার্থক ছোটগল্প না হলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও চেষ্টা করেছিলেন তাঁর 'রাধারাণী' এবং 'যুগলাঙ্গরীয়'তে।এছাড়াও সূচনা লগ্নে স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের মধ্যে গল্প চর্চার স্বল্পতম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে ছোটগল্প রচনার জন্য যে যুগসন্ধিক্ষণের প্রয়োজন ছিল, যে অস্থির সামাজিক পরিবেশ ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল, সেই পরিসর তখনো বাংলা সাহিত্যে তৈরি হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালির কানে ধ্বনিত হল 'কালের যাত্রার ধ্বনি'। সেই 'ধ্বনি'তে সাড়া দিলেন বাংলা সাহিত্যের সার্থক যুগ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উনিশ শতকীয় বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সগৌরব স্বীকৃতি তাঁরই প্রাপ্য।

'সাহিত্যে ছোটগল্প' নামক গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

Anusandhanvallari
Vol 2020, No.1
February 2020
ISSN 2229-3388

"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[৩]

ছোটগল্প হবে ইঙ্গিতমূলক, বিবৃতিধর্মী নয়। ছোটগল্প যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই প্রকৃত অর্থে গল্পের আস্বাদন শুরু হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়-

"একটি ক্ষুদ্র আখ্যান খন্ডে সমগ্র জীবন তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পের কারুকার্যখচিত একটি ছোট পাত্রে সমগ্র জীবন প্রবাহের গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা; বৃহদাকার ঘটনা ইক্ষুদন্ডের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট রসসারটুকুকে নিষ্কাশন করিয়া বস্তুভার অসহিষ্ণু অথচ রসপিপাসু ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরা। ছোটর মধ্যে যে বড়োর বীজ প্রচ্ছন্ন,সমগ্র জীবনের অভিপ্রায় যে দুই একটি ঘটনার রেখাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত থাকে, অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরা স্ফটিকস্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা তৃপ্তি ঘটায়- এই নিগূঢ় জীবন সত্যটি ছোটগল্পে বিধৃত।"[৪]

রবীন্দ্র পূর্ববর্তী লেখকরা গল্প আখ্যান রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম সচেতনভাবে ছোটগল্প নির্মাণে প্রবৃত্ত হন, তাই তিনিই ছোটগল্পের সার্থক রূপকার। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নন, বিশ্ব সাহিত্যের ছোটগল্পের আসরে স্বীকৃত গল্পলেখকদের সমকক্ষও বলা যায়। ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর মনের মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক রূপে যোগ দেন, তখন প্রতি সংখ্যায় তিনি একটি করে ছোটগল্প লিখতেন। পরবর্তীতে 'হিতবাদী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও ছোটগল্প রচনার ঝোঁক তিনি ছাড়তে পারেননি। তবে রবীন্দ্রনাথ যে সময়টাতে ছোটগল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন, সেই সময়টাতে আমাদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ এই দশ বছর কাল সময়সীমাকে ভারতীয়দের জীবনে চরম দুঃখ দুর্দশার অধ্যায় রূপে চিহ্নিত করা যায়। সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ, দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, বৃটিশের দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব এবং অস্ত্র আইনের মাধ্যমে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে গ্রামবাসীদের আত্মরক্ষার উপায়টুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। দেশে শুরু হলো দমন নীতি।

চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী পৃথক পৃথক কর্ম প্রণালী নির্ধারণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মন থেকে কারো কর্ম প্রণালীকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি তাঁর স্বদেশকে ভালোবাসতেন এবং এই দেশকে তিনি রাজনৈতিক আবর্জনামুক্ত, ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা নিয়ে তার যে মানবিক রূপ, সেই বাঞ্ছিত রূপটাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের কর্মপ্রণালীর মধ্যে তিনি সেই রূপকে খুঁজে পেলেন না। বরং তিনি উপলব্ধি করলেন এই সমস্ত আন্দোলন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করছে এবং মানুষের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার জন্মদিচ্ছে। অখন্ড মানব প্রীতি বা মানব মৈত্রীর বদলে যে হিংসার বীজ তিনি অঙ্কুরিত হতে দেখলেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাঁকে বেদনার্ত করে তুললো। সেই অস্থির পরিবেশ ও পরিস্থিতি বাংলা ছোটগল্পের জমি তৈরি করে দিল।

রবীন্দ্রনাথকে যখন জমিদারী কাজকর্মের দেখাশোনা করার জন্য শিলাইদহে প্রেরণ করা হল, তাঁর সেই শিলাইদহ যাত্রা বাংলা গদ্য সাহিত্যের এক অপূর্ব প্রাপ্তির দ্বার উদ্ঘাটন করে দিল।

পদ্মাতীরে জমিদারীর কাজকর্ম তদারকি করতে গিয়ে তিনি বাংলার গ্রাম জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হলেন। মাটির পৃথিবীর মাটির মানুষের সুখ দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধি করলেন। তাদের হাসি-কান্না, কলহ, নীচতা, স্নেহ ভালবাসা, স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার সংমিশ্রণে পল্লী বাংলার যে জীবন গড়ে উঠেছে, সেই জীবনকে গল্পের আকারে রূপ দিতে উৎসাহী হলেন।

পদ্মার চর থেকে সোনার তরীতে বোঝাই ছোটগল্পের ফসল তিনি পৌঁছে দিলেন গল্প পাগল বাঙালির ঘরে ঘরে। ধূয়াশাচ্ছন্ন কলকাতার অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে দূরে সরে এসে শিলাইদহে পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পেলেন এক নতুন জীবন দর্শন ও জীবনের এক পূর্ণতর রূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্নপত্র'-এর এক জায়গায় লিখেছেন-

"আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্য ক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্তহৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।"[৫]

পল্লীজননীর এই অশ্রুর ধনগুলির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন অসংখ্য গল্পবীজ, যার ফসল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে 'ছুটি', 'সমাপ্তি', 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা', 'দেনা-পাওনা', 'তারা প্রসন্নের কীর্তি', 'রাম কানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' প্রভৃতি অসংখ্য ছোটগল্প। কলকাতায় ফিরে এসেও অব্যাহত ছিল ছোটগল্প রচনার ধারা। সমাজ সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেন 'ত্যাগ', সমস্যাপূরণ', 'খাতা', 'বিচারক', 'দিদি', 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি গল্প। পরাধীনতার মর্মজ্বালা ধরা দিল 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে। বিচিত্র রসের গল্প রূপে ধরা দিল 'মহামায়া', 'জীবিত ও মৃত', 'সম্পত্তি সমর্পণ' ও 'মণিহারা'। শাশ্বত পিতৃহৃদয়ের অপত্য স্নেহরসে শিঞ্জিত করে রচনা করলেন 'কাবুলিওয়ালা'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে মানুষের চিরকালের সত্যকে, চিরদিনের সমস্যাকে ও মানবতাবোধকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি সমকালীন হয়েও চিরকালীন এবং স্থানিক হয়েও সর্বদেশীয়। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত গল্পে আধুনিক জীবনের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরার সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন- 'রবিবার', 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সমূহ 'গল্পগুচ্ছ' নামক গ্রন্থে তিনটি পৃথক পৃথক খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে। শিল্প লক্ষণের দিক দিয়ে বিচার করলে গল্পগুলি যেমন উৎকৃষ্টতার দাবি রাখে, তেমনি বাঙালির গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের ছবি হিসেবে ও সেগুলি বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রূপে পরিগণিত হয়। মানুষের গভীর সত্তার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের গল্পে যেভাবে ধরা দিয়েছে, ইউরোপের পুরোনো দিনের খুব কম লেখক তা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রসঙ্গে প্রথম চৌধুরী বলেছেন-

"বঙ্গ সাহিত্যের অপর নানা ক্ষেত্রেও যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আদি লেখক। আমার বিশ্বাস, তিনি সর্বপ্রথম হিতবাদী পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন; তারপর সাধনায় তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়। তিনি হচ্ছেন বঙ্গ সাহিত্যে ছোটগল্পের আদি স্রষ্টা; এবং এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি অফুরন্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথের গল্প Maupassant-র প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙলার অধিকাংশ লেখকের গল্পে স্পষ্ট লক্ষিত হয়।"[৬]

১৮৯১ থেকে ১৯৩৩ এই চল্লিশ বছরের সময়সীমায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় নব্বই এর কাছাকাছি ছোটগল্প রচনা করেছেন। এই গল্প রচনার সময়সীমাকে পত্রিকার ভিত্তিতে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব হিসেবে ধরা যায় 'হিতবাদী সাধনার যুগ' (সময়সীমা ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩), দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে ধরে নেওয়া যায় 'সাধনা ভারতীর যুগ'কে (সময়সীমা ১৮৯৪ থেকে ১৯০২) এবং তৃতীয় পর্ব হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'ভারতী-সবুজপত্রের যুগ'কে (সময়সীমা ১৯০৩ থেকে ১৯৩৩)।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে বাংলা গল্প সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম অবশ্যই স্মরণ করা যেতে পারে, যদিও দু'জনের গল্প রচনার ধারা স্বতন্ত্র ছিল।প্রাচীন বৈঠকি মেজাজের সঙ্গে সমাজ সমালোচনা মেশানো সমাজ মনের সম্মিলিত সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলি। সহজ, সরল ভাষায় কৌতুক মেশানো ভঙ্গীতে ও নির্মম সমালোচনায় সমাজ নিবিড়সত্যতার অভিজ্ঞান তাঁর গল্পের লক্ষণ। ত্রৈলোক্যনাথের রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হলো- 'ডমরু চরিত', 'লাল্লু', 'নয়ন চাঁদের ব্যবসা', 'মুক্তামালা' ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যনাথের লিখনশৈলী অনেকটাই লোকায়ত সাহিত্যের পথ অনুসরণ করেছে। রূপকথা বা উপকথার অবাস্তব জগৎ থেকেও তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর গল্প রচনার শিল্প অভিপ্রায়ের বাস্তবতা ক্ষুণ্নহয়ে যায়নি। তাঁর গল্প রচনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় কথনশৈলীতে। গল্পের বক্তা গল্পের সঙ্গে সব সময় জড়িয়ে থাকেন না। অনেক সময় দেখা যায়, তিনি একজন নিরপেক্ষ কথক মাত্র। অনেক সময় আবার বৈঠকি চালে গল্পের মধ্যে গল্প খুঁজে পাওয়া যায় অনায়াসেই। গল্প যেন গড়িয়ে চলে নিজের খেয়াল খুশি মত।

রবীন্দ্র সমকালে লালিত আরও এক ছোটগল্পকার হচ্ছেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বেশিরভাগ গল্পেই জীবনকে দেখেছেন কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে। তবে তাঁর সেই কৌতুকরস পরিবেশনের দক্ষতায় বাস্তবের খরতাপকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তুলেছে। প্রভাতকুমারের সব গল্প শিল্প রসোত্তীর্ণ না হলেও 'দেবী', 'আদরিণী', 'রসময়ীর রসিকতা', 'কাশীবাসিনী' প্রভৃতি গল্প ছোটগল্পের আসরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা দাবি করতে সক্ষম।

'দেবী' গল্পে আমরা দেখি অলৌকিক ধর্ম বিশ্বাস মানুষের জীবনে কতখানি ট্রাজেডি সৃষ্টি করতে পারে তারই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। যে নববধূ স্বামী সোহাগিনী হয়ে সংসারধর্ম প্রতিপালনের প্রত্যাশী হয়ে স্বামীগৃহে পদার্পণ করলো, শুভরাত্রির অবসানে শ্বশুরের অলৌকিক ধর্ম বিশ্বাসের বলি হয়ে সাধারণ মানবী থেকে রাতারাতি সে হয়ে উঠলো দেবী। শুধু শ্বশুর কালীকিঙ্কর নন, ধীরে ধীরে সমস্ত গ্রামবাসী এবং সেই নব বিবাহিতা বধূ দয়াময়ীও নিজেকে দেবী বলে ভাবতে শুরু করলো। পিতার ধর্মান্ধতার বেড়াজাল ভেদ করে দয়াময়ীর স্বামী উমা প্রসাদ স্ত্রীকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দয়াময়ী রাজি হয়নি। কেননা সে নিজেও ততদিনে

দেবীত্বের মায়ায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার সেই বিশ্বাসে চরম আঘাত হানলো, জ্বরাক্রান্ত অসুস্থ তারই ভাসুরপুত্রের মৃত্যু। শ্বশুরের কাতর আবেদন সত্ত্বেও দয়াময়ী খোকার প্রাণ দানে ব্যর্থ হলো। দেবীত্বের অহংকার তার চূর্ণ হয়ে গেল। দেবীত্বের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে এল মানবী দয়াময়ী। খোকার মৃত্যুর জন্য সে নিজেকেই দায়ী করলো। তাই শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্য করতে, নিজেরই পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে সে ঠাকুর ঘরের কড়িকাঠে ঝুলে প্রাণ ত্যাগ করলো। এখানেই গল্পের সমাপ্তি। গল্পকারের কৃতিত্ব এই যে, তিনি সরাসরি কোন তত্ত্বঘোষণায় প্রবৃত্ত হননি বলেই জীবনের এক গভীরতর সত্যকে শিল্প রূপ দিতে সফল হয়েছেন।

রাজশেখর বসু যিনি পরশুরাম নামে সর্বাধিক পরিচিত, বাংলা ছোটগল্পের আসরে তিনিও তাঁর উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রচ্ছন্ন তিরস্কার মিশ্রিত রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুকের শিল্প রসে উপস্থাপিত 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিকিৎসা সংকট', 'লম্বকর্ণ', 'ভূশন্ডীর মাঠে', 'স্বয়ম্বরা', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'জাবালি', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'পরশপাথর' প্রভৃতি গল্পগুলি মূলত সমাজ সমালোচনামূলক হলেও গল্পগুলির আবেদন পাঠকের কাছে বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ করলেও তাঁর রচনার ধারাটি ছিল ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত। তিনি এক অভিনব শিল্পবোধের ধারক ও স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্ট গল্পগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের বাঁক বদল হলো, তৈরি হলো এক নতুন ধারা। তর্ক, যুক্তি ও জীবনাসক্তি তাঁর গল্পের প্রধান লক্ষণ। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি যেন আভিজাত্যের জৌলুষে ঝল মলে। অতিরিক্ত ভাব প্রবণতা, অকারণ বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের একঘেয়ে প্রয়োগকে তিনি তাঁর গল্পে স্থান দেননি। বুদ্ধিদীপ্ত সকৌতুক হাসির উপস্থিতি প্রমথ চৌধুরীর গল্পেই প্রথম ধরা দেয়। তিনি গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা বা সামাজিক, সাংসারিক ও রাজনৈতিক কোন আদর্শ প্রচারে ব্রতী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ শিল্প রসের একান্ত অনুরাগী। প্রমথ চৌধুরীর গল্পে আছে দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সেইসঙ্গে বিশ্বজ্ঞানের সমাবেশ।

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম গল্প 'ফুলদানি', তবে এটি ফরাসী লেখক প্রস্পার মেরিমের 'Etruscan vase' গল্প থেকে অনুদিত। তাঁর প্রথম নিজস্ব রচনা 'চার ইয়ারি কথা' 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। এই গল্পটি পৃথক পৃথক চারটি গল্পের সমষ্টি, তবে তা একসূত্রে গাঁথা। একদিন সন্ধ্যারাতে আসন্ন ঝড়বৃষ্টির শঙ্কায় চার বন্ধু একটি ক্লাব ঘরে আটকে পড়ে। এরা প্রত্যেকেই অভিজাত পরিবারের শিক্ষিত ও বিলেত ফেরত যুবক। আটকে পড়া যুবক চতুষ্টয় সময় অতিবাহিত করতে গিয়ে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে নিজেদের প্রেম ও প্রণয়ের গোপন মুহূর্তগুলি স্মৃতির দর্পণে বন্ধুদের কাছে তুলে ধরেছে। চার বন্ধুর পৃথক চারটি প্রেমের অভিজ্ঞতা দিয়ে গল্পটি গড়েউঠেছে। প্রত্যেকটি কাহিনীর নায়িকারা শ্বেতাঙ্গী বিদেশিনী। প্রথম গল্প সেনের কথা দিয়ে শুরু। গল্পের পটভূমি কলকাতার গঙ্গার ঘাট। এই গল্পের নায়ক সেন-এক পূর্ণিমা রাতে গঙ্গার ঘাটে এক ইংরেজ যুবতীকে দেখেছিল। পূর্ণিমার আলোর মত উজ্জ্বল তার রূপ। পূর্ণিমার সেই স্নিগ্ধ আলোর বন্যায় মেয়েটিকে দেখামাত্র সেনের হৃদয়েও প্রেমের জোয়ার নেমে এল। মেয়েটিও স্মিত হাসিতে সম্মতি জানালো এবং পাশে এসে বসে হাত রাখলো সেনের হাতে। নীরব মুহূর্ত বয়ে

গেল অনুভূতির আবেগে, তারপরই মোহ ভঙ্গ হলো সহসা লোক সমাগমে। মিনিট খানেকের মধ্যে প্রকাশ পেল মেয়েটি বদ্ধ উন্মাদ।পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। গারদের রক্ষকবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সেই উন্মাদিনী প্রিয়তমার অট্টহাসি আর কান্না নায়কের সমস্ত স্বপ্নকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে তার প্রাণে ছড়িয়ে দিয়ে গেল এক গুচ্ছ বেদনার উচ্ছ্বাস।

সেন বলে-

"এই আমার প্রথম ভালোবাসা, আর এই আমার শেষ ভালোবাসা।... আমি সেই দিন থেকে চিরদিনের জন্য eternal feminineকে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।"[৭]

এখানে গল্পের ঘটনাংশ ছাপিয়ে উপলব্ধির ব্যঞ্জনা প্রধান হয়ে ওঠে। সেই প্রেমোপলব্ধিই গল্পটির কেন্দ্রীয় অনুভব।

দ্বিতীয় গল্প সীতেশের কথা।গল্পের পটভূমি ইংল্যান্ড, নায়ক সীতেশ। কোন এক বর্ষার সন্ধ্যায় লন্ডনের পথে উদ্দেশ্যেহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় সীতেশের সঙ্গে এক বইয়ের দোকানে দেখা হলো এক রহস্যময়ী নীলাক্ষি শ্বেতাঙ্গীনির। প্রথম দর্শনেই সীতেশের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলো মেয়েটির জন্য। স্বল্প আলাপচারিতার পর পুনর্সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করলে মেয়েটি সীতেশের পকেটে একটি কার্ড রেখে মুহূর্তে অন্তর্ধান হয়ে গেল। মেয়েটি চলে যাওয়ার পর পকেটে হাত দিয়ে সীতেশ বুঝতে পারলো প্রণয়িনী তাকে ঠকিয়ে তার গিনিগুলি নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু সেই পকেটমার মেয়েটি নায়কের মনে ভালবাসার এক নীল রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে গেছে। সেই রহস্যময়ী প্রবঞ্চক সুন্দরীটির উপর সীতেশের রাগ হয়নি, বরং তার জন্য মনে এক দুঃখবোধ জেগে উঠেছিল।

এভাবেই প্রমথ চৌধুরী সেই চিরকালীন বাঙালির প্রেম ধারণায় অগ্নি বিপ্লব আনলেন তাঁর সৃষ্ট কতিপয় বাঙালি যুবক ও তাদের বিচিত্র প্রেম অভিজ্ঞতার সমাহারে।

তৃতীয় গল্প গড়েউঠেছে সোমনাথের প্রেম কথার ভিত্তিতে। অনিদ্রারোগের হাত থেকে আরোগ্য লাভের আশায় গল্পের নায়ক সোমনাথ ইংল্যান্ডের সমুদ্রের ধারে এক ছোট্ট শহরে বায়ু পরিবর্তন করতে গিয়েছিল। সেখানে দেখা হয় এক ইংরেজ রমণীর সঙ্গে, যাকে সে ভালবেসেছিল এবং রিণী নামে ডাকতো। কিন্তু সেই মেয়েটি তার ভালবাসার মানুষ জর্জের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্যে সোমনাথের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে যায় শুধু। নিজের কার্যসিদ্ধি হওয়ার পর অর্থাৎ প্রেমিক জর্জকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে সেই পছন্দের মানুষটিকে বিয়ে করে সোমনাথকে ছেড়েচলে যায়। তবু সোমনাথের মনে সে রেখে যায় ভালবাসার শিশিরবিন্দু। তাই সোমনাথ বলতে পারে-

"...পৃথিবীতে যে ভালোবাসা খাঁটি, তার ভিতর পাগলামি ও প্রবঞ্চনা দুইই থাকে, ওইটুকুই তো ওর রহস্য।"[৮]

চতুর্থ গল্প রাতের কথা বা আমার কথা, যা গল্প কথকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রসূত। গল্প কথক মি. রায়, এক সময় লন্ডনের যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানে 'আনি' নামে এক পরিচারিকা ছিল। রায় তাকে দেখেছিলেন সেবাপরায়ণারূপে, কিন্তু সে রায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিল। পরবর্তীতে ভদ্র ঘরের অল্প শিক্ষিতা কন্যা আনি অসুস্থ হয়ে এক ডাক্তারের সংসর্গে আসে এবং আরোগ্যলাভের পর আন্তরিকতার সঙ্গে ডাক্তার তাকে বিবাহ করেন। অবশেষে আনি ও তার স্বামীকে নার্স এবং ডাক্তারের ভূমিকা নিয়ে ফ্রান্সের যুদ্ধে যোগ দান করতে হয়। সেখানে রণক্ষেত্রে একটি গোলার আঘাতে মৃত্যু হয় আনির।

আনির কাছ থেকে চলে আসার দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধানে এক রাতে কলকাতায় মি. রায়ের কাছে একটি ফোন আসে। টেলিফোনে আনি তার গোপন ভালবাসার কথাটি রায়ের কাছে ব্যক্ত করলো, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। খবরটি শুনে মি. রায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। এখানেই গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে।

চার বন্ধুর এই বিচিত্র প্রেম-অভিজ্ঞতা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে পাঠকের সমস্ত প্রচলিত প্রেম সম্পর্কিত ধারণা ও অভ্যস্ত সংস্কারকে বিচলিত ও বিপর্যস্ত করে দেয়। তবে বিশুদ্ধ গল্প রস ও বিচিত্র স্বাদের জন্য গল্পগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নীতি শাসন মুক্ত বেপরোয়া প্রেমের প্রাণচাঞ্চল্যের স্বীকৃতি রয়েছে এখানে। লেখক বলেছেন-

''চার ইয়ারী কথায় যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগমণি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা চার ইয়ারী লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার ফুল (fool) হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের সোয়ান সং (swan song) গাওয়া হয়েছে ওতে।''[৯]

প্রথম চৌধুরীর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'আহুতি'। 'আহুতি' গল্পে দেখি রুদ্রপুরের মধ্য দিয়ে পাল্কি করে যাওয়ার সময় লেখকের স্মৃতির দর্পণে রুদ্রপুরের সমৃদ্ধশালী চেহারা এবং এর পতনের ছবিটি ফুটে ওঠে। রুদ্রপুরের বিধবা রাণী রত্নময়ীর পুত্রকে হত্যা ও তার ফলশ্রুতিতে রত্নময়ীর অদ্ভুত প্রতিহিংসা পরায়ণতা বর্ণনায় লেখক একই সঙ্গে করুণ ও ভয়ানক রসের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন এমনভাবে, যা আমাদের অসাড়মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। প্রমথ চৌধুরীর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই নির্মাণ কৌশলে অনবদ্য, বিদগ্ধ মননঋদ্ধ।

১৯২৩ সালে জন্মহল 'কল্লোল' পত্রিকার। সাহিত্যের এক নবীনতর পত্রিকা, যাতে বিশেষভাবে গল্পই প্রকাশিত হত। যৌবনের স্বপ্ন, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন কল্লোলগৌষ্ঠীর তরুণ লেখকরা; সাহিত্যে এক নতুন বাঁক বদলের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তখন দেশ যে বিপর্যয় ও ভাঙনের মুখে পড়েছিল, সেই অস্থির সামাজিক পরিবেশে এই নব আবির্ভূত লেখকরা বেড়েউঠেছেন। তাই তাঁদের মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অস্থির ও বিপর্যস্ত সমাজের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে গড়েওঠা সাহিত্যে স্পষ্টতই বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়। সেই বিদ্রোহের সুর রবীন্দ্রভাবধারার বিরুদ্ধেও। কল্লোলগৌষ্ঠীর লেখকরা ছিলেন

সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত। তাঁদের রচনায় প্রায়শই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক ভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়।

সেই সময়টাতে 'কল্লোল'-এর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল আরও কিছু সাহিত্য পত্রিকা, যেমন- 'সংহতি', 'ধূপছায়া', 'বিজলী', 'কালি কলম', 'উত্তরা', 'বিচিত্রা', 'প্রগতি' প্রভৃতি। সেইসঙ্গে 'প্রবাসী' আর 'মাসিক বসুমতী' ও ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ লেখকদের গল্পগুলি এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত হত, যে গল্পগুলিকে বলা যায় সমাজবৃত্তে স্থাপিত ব্যক্তিক সংকটের গল্প। সমাজ ও ব্যক্তি মনের সংঘাতের যে বেদনা, সেই বেদনাই আধুনিক ছোটগল্পকে মূর্ত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই বেদনা ছিল, তবে তাঁর সেই ব্যথাতুর দৃষ্টি, প্রধানত ব্যক্তিগত শিল্পী মানসের দৃষ্টি। অস্তিত্বের সংকট রবীন্দ্রনাথের গল্পে তেমনভাবে ধরা দেয়নি।

উত্তর রৈবিক কথা সাহিত্যিক হিসেবে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তিনজনই ঔপন্যাসিক হিসেবে বেশি সুপরিচিত হলেও গল্পের জগতেও তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিভূতি ভূষণের গল্পগুলি পল্লীর পরিত্যক্ত বনবাদাড়ের বুনোফুলের গন্ধ ও তার অনুভবে যেমন অনুপম, ঠিক তেমনি পল্লীবাংলার অবহেলিত, অনাদৃত চরিত্রগুলিও লেখকের প্রতিভার জাদুকাঠিতে অমরত্ব লাভ করেছে। বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'উপেক্ষিতা'। একটি অতি সাধারণ, গ্রাম্য নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূকে নিয়ে লেখা। বিভূতিভূষণকে গার্হস্থ্য জীবনের সার্থক রূপকার বললেও অত্যুক্তি হবে না। পল্লীগ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত অতি সাধারণ মানুষ নিয়েই তাঁর সাহিত্য জগৎ গড়েউঠেছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি অতি পরিচিত বাস্তব চরিত্র। রচনার গুণে সেই অতি পরিচিত চরিত্রগুলি আরও সজীব হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের প্রকাশিত গল্প সংখ্যা প্রায় ২২৪ এবং গ্রন্থ সংখ্যা উনিশ। তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে পাঠককুলকে তিনি উপহার দিতে পেরেছেন শাশ্বত, পরিপূর্ণ জীবনের অনুভূতি।

তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি' ও দ্বিতীয় গল্প 'হারানো সুর' প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' মাসিক পত্রিকায়। কিন্তু কল্লোলীয় ভাবধারার সঙ্গে গল্প দুটির কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। দুটি গল্পই বৈষ্ণব সমাজ ও বৈষ্ণব প্রেমাশ্রিত। পশ্চাত্য জীবনাদর্শ, সমরোত্তর পশ্চিমী দুনিয়ার যৌবনের উচ্ছ্বাস ও বিদ্রোহ যা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা রপ্ত করেছিলেন, তারাশঙ্করের মানসিকতার সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। তারাশঙ্করও বিভূতিভূষণের মত মূলত গ্রাম জীবনের শিল্পী। গ্রামের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য নাড়ির টান লক্ষ্য করা যায়। কল্লোলীয় গোষ্ঠীর সংশয়ী দ্বিধাগ্রস্ত জীবনদৃষ্টি নয়, তারাশঙ্কর ছিলেন মানবধর্ম ও আস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী। তারাশঙ্করের রচিত গল্প ও গ্রন্থ সংখ্যা অনেক। তবে তাঁর রচিত 'না', 'কবি', 'শ্যামাদাসের মৃত্যু', 'বোবা কান্না', 'পৌষলক্ষ্মী', 'দেবতার ব্যাধি', 'ইমারত', 'কামধেনু', 'মাটি', 'শিলাসন', 'দীপার প্রেম','শশী ঠাকরুণ'-এই বারোটি গল্পের মধ্য দিয়ে জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী সত্তার সামগ্রিক পরিচয় পাঠকের চোখে ধরা দেয়। জীবন অভিজ্ঞতার অপর্যাপ্ত বৈভবে এই লেখক রাঢ়বঙ্গকে বাংলা সাহিত্যের জগতে চিরস্থায়ী

করে তুলেছেন। ডোম, কাহার, বেদে, বাজিকর, সাঁওতাল, বাউরি, কবিয়াল, বৈষ্ণব, জমিদার প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের চরিত্রের উপস্থিতিতে তারাশঙ্করের গল্পবিশ্ব সজীব ও বর্ণময় হয়ে উঠেছে।

লেখকের ভাষায়-

"আমার সাহিত্য কর্মের মধ্যে কালের বিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বিশেষ ধারার ব্যক্তিত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এসব আমার নিজের চোখে দেখা।"[১০]

সময়ের প্রবহমান ধারার প্রতি সজাগ দৃষ্টি, সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, বিলীয়মান গোষ্ঠী ও সংস্কৃতির প্রতি নিবিড়ভালবাসা ও সেইসঙ্গে পরম মমতায় মাটি ও মানুষকে শেকড়সুদ্ধ সাহিত্য জগতে উপস্থাপিত করার নিষ্ঠায় তারাশঙ্কর বাংলা ছোটগল্পে এক নতুন পথের দিশারী।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থাহীন জীবন সম্পর্কে তীর্যক দৃষ্টি, মানব মনের অন্তর্গূঢ়জটিলতার মনোগহনে সঞ্চরণশীল, সংশয়, অবিশ্বাস ও বিজ্ঞানবুদ্ধিকে আশ্রয় করে যে আধুনিকতার সূচনা হল এর প্রবর্তক জগদীশ গুপ্ত। মানব জীবনের নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতা প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর গল্পে।

লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই ধারারই কথাশিল্পী। তাই ভাবধারার দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জগদীশ গুপ্তের উত্তরসূরী বলা যায়। তবে জগদীশ গুপ্তের মত তিনি জীবন সম্পর্কে ততটা নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক বাহুল্যতাকে বর্জন করে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে সমাজবদ্ধ মানুষকে চিনতে চাইলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী' ততটা শিল্প কুশলতা লাভ করেনি। এক আত্মভোলা বংশীবাদক ও তার পতিব্রতা স্ত্রীর কারুণ্য ও হৃদয়াবেগের সমন্বয়ে গড়া ওঠা এক রোমান্টিক প্রেমের গল্প। দ্বিতীয় গল্প 'নেকী'তেও এই রোমান্টিকতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তারপর থেকেই লেখক সৃষ্ট চরিত্রগুলি বদলাতে থাকে, যা ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ পরিচয় বহন করে। তাঁর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা প্রায় দুইশত এবং গ্রন্থ সংখ্যা ষোল। 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে লেখক নীলমণি চরিত্রের মধ্য দিয়ে দুর্বিসহ দুঃখ যন্ত্রণা ও অন্তহীন ইতরতার ছবি তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে তাকে নৈরাশ্য থেকে সংগ্রামের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। নৈরাশ্যে ভেঙে পড়া নয়, জীবন যুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে আত্মবিস্তারই জীবনের লক্ষ্য, নীলমণির এই উপলব্ধিতে গল্পের সমাপ্তি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম প্রধান গল্প। এই গল্পে লেখক ভিখু ডাকাতের বীভৎস আদিম, নিষ্ঠুর মানব রূপটি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন এবং বিভিন্ন ঘটনার সমাহারে পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ভিখুর জীবনে সভ্যতার আলো পড়েনি, প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে তার উত্থান ও বিলয়।

'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'সর্পিল' ইত্যাদি গল্পে লেখক মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তির জান্তবস্বভাবকে তুলে ধরেছেন। আবার 'হারানের নাতজামাই' অথবা 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'র মত গল্পে রাজনৈতিক তত্ত্বের নিরিখে সমাজ ও শ্রেণীগত মানুষের

অবস্থান, তাঁর মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার শিল্প বীক্ষার ফসল। লেখকের 'অতসী মামী' এবং 'নেকী' ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলি থেকে বলা যায় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের জগতে এক বুর্জোয়া ভাবাদর্শের লেখক, যিনি মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, হীনতা ও স্বার্থপরতার নগ্ন রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর বাস্তবতায় সাধারণ বাস্তব মানুষকে সাহিত্যে অমরত্ব দিতে চেয়েছিলেন। আবার 'ভূমিকম্প', 'বিপত্নীক', 'টিকটিকি', 'মহাকালের জটার জট' প্রভৃতি গল্পে লেখক ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে গল্পের আদলে সাজিয়ে জীবনের বিকারকে তুলে ধরেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন দৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ লিখেছেন-

"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আসল ব্যাপার হল তাঁর নিজের চোখ। একেবারে জ্বলজ্বলে, ড্যাবডেবে এক জোড়া চোখ। বোধহয় তার রঞ্জন রশ্মি ও ছিল। এমন আনকোরা, নতুন চোখে জীবনকে তার আগে কেউ দীর্ঘকাল দেখেননি। আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস সবকিছু দেখার ধরন আগাপাশতলা বদলে গেল। বিনা প্রশ্নে কোন মূল্যই আমরা আর গ্রহণ করিনি। মানিকের পর বাংলা সাহিত্যে শরীর বদলেছে, সাজগোজ ঘটেছে অনেককিছু। কিন্তু ওই দুটি চোখ? তারপর নতুন চোখ আর এল না, এখনও আসেনি।"[১১]

বাংলা ছোটগল্পের শিল্প রূপ নিয়ে অবিরাম অন্বেষণ চালিয়ে যিনি আমাদের মনে চমক জাগিয়ে তুলেছেন, তিনি হচ্ছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যিনি 'বনফুল' নামে পরিচিত। বলাইচাঁদও কল্লোলীয় ভাবধারা মুক্ত এক লেখক, যার লেখনীতে রূগ্ন সময়ের ক্ষত বিক্ষত মুখটি নানা মাত্রায় তুলে ধরা হয়েছে। গল্পহীন গল্প রচনার যে প্রবণতা তখন সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল, বলাই চাঁদ ছিলেন সেই ধারার পথপ্রদর্শক। 'প্রজাপতি' বা 'রামায়ণের এক অধ্যায়' এই অনুগল্পগুলি ছোটগল্পের ক্ষীণায়মান অবয়বের নিদর্শন। এছাড়াও কথকতার আদলে রচিত 'নিমগাছ' অথবা গল্প ও কবিতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'ভৈরবী ও পূরবী' কিংবা 'দুই চিঠি'র মত গল্পগুলি লেখকের সদা অন্বেষণরত শিল্পীসত্তার নবনির্মিতির প্রয়াস।

বাস্তবতার এক নতুন রূপ নিয়ে চল্লিশের দশকে বাংলা ছোটগল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ করেন সুবোধ ঘোষ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ফসিল'। এই গল্পটিতে লেখকের নিজস্ব জীবন দৃষ্টি',নৃতত্ত্বও ভূতত্ত্বের গবেষণালব্ধ জ্ঞান, মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, কূটকৌশল ও অন্তর্গূঢ় জটিলতার নতুন বিশ্লেষণ, শ্রমিক শ্রেণী ও মহাজনশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-বৈষম্য এক নতুন রূপে, নতুন জীবনদৃষ্টির ব্যাখ্যায় ধরা দিল। তাই এই গল্পটি সেদিন পাঠককুলকে দারুণ চমকে দিয়েছিল। এছাড়া 'পরশুরামের কুঠার', 'জতুগৃহ', 'কুসুমেষু', 'সুন্দরম', 'বারবধূ', 'তমসাবৃতা', 'স্বর্গ: হইতে বিদায়', 'স্নানযাত্রা' প্রভৃতি গল্পে তিনি ক্লান্তিহীনভাবে অন্তর্গূঢ় জটিলতার পথে স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা করেছেন। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত দুটি ছোটগল্প 'কালাগুরু' ও 'শিবালয়' গল্প দুটিকে সেই সময়ের ঐতিহাসিক দলিল রূপে গণ্য করা যায়।

ত্রিশের দশক থেকেই বাংলা ছোটগল্প সময়ের অভিঘাতে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে দুটি ধারা সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছিল। একদিকে কল্লোলগোষ্ঠীর বিদ্রোহী বাস্তবতা, প্রবৃত্তি তাড়িত জীবনে পেটের খিদে থেকে যৌনতার খিদে, যা সাহিত্যে গল্পের আকারে রূপ নিল। এই

ধারার লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনীশ ঘটক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অন্যতম। অন্যদিকে বিভূতিভূষণের নিসর্গ প্রকৃতিময়তায়, তারাশঙ্করের রাঢ়বঙ্গের অফুরান আঞ্চলিক জীবন অভিজ্ঞতায় ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নবনির্মিতির প্রবহমান ধারায় অনুচ্চার অভাজন বন্দনায় প্রবাহিত ছিল ছোটগল্পের অন্য ধারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে শুরু করে চল্লিশের দশককে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিপর্যয়ের দশক রূপে চিহ্নিত করা যায়। এই সময়সীমায় দেশে মন্বন্তর, যুদ্ধকালীন পরিবেশে কলকাতার সমাজ জীবনের অধোগতি, নৈতিক মূল্যবোধের বিনাশ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা ও দেশভাগ, প্রব্রজন ও পুনর্বাসন এই সমস্যাগুলির সমন্বয়ে প্রবল সামাজিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন জীবনের পরিচিত ধারাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। সময়ের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির দহনবেলায় জন্মনিল, সমরেশ বসুর 'আদাব', মনোজ বসুর 'মন্বন্তর', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন'-এর মত গল্প।

সেই সময়কার প্রতিটি গল্পই বিপর্যয়ের ফসল না হলেও কোন লেখকই সমকালীন সময় ও সমাজকে অতিক্রম করতে পারেননি। তাই সেই বিশৃঙ্খল, হতাশাপূর্ণ, বিপর্যস্ত সময় ও মূল্যবোধহীন সমাজের চিত্র প্রতিটি ছোটগল্পকারের গল্পেই কম বেশি উঠে এসেছে। কোন কোন লেখক আবার জটিল মনোবিকলনকে বৈজ্ঞানিক বীক্ষায় তুলে ধরতে চাইলেন যৌনমনস্তত্ত্বমূলক গল্পের মাধ্যমে। বিমল করের 'আত্মজা', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' পরিচিত যৌন চেতনার গন্ডী অতিক্রম করে এক ব্যতিক্রমী সাহসিকতার নিদর্শন হয়ে রইলো। মোট কথা চল্লিশের দশকের সময়সীমায় বাংলা ছোটগল্প যথার্থ অর্থে বহুবাচনিক ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠলো। গল্পবিশ্বের এক স্বতন্ত্র কারুকৃতিময় প্রকোষ্ঠ সৃজন করলেন কমলকুমার মজুমদার।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু সেই রক্তাক্ত খন্ডিত স্বাধীনতা হাজার হাজার বাঙালিকে বাস্তুহারা করে তুলেছিল। শুরু হলো উদ্বাস্তু সমস্যা ও সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও অন্তেবাসীদের মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই। বাস্তবের সঙ্গে নির্মম সংঘর্ষে পুরোনো মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ক্ষত বিক্ষত হয়ে প্রতিনিয়ত পরাজয়ের পথে ধাবিত হয়েছে। সেই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির প্রতিফলনরূপে সাহিত্যে উঠে এসেছিল মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিকায়িতের জীবন জিজ্ঞাসা ও পরিবর্তিত মূল্যবোধ অবলম্বনে নতুন ধারার সামাজিক গল্প। সেই ধারার লেখকদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, স্বাধীনতা পরবর্তী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। ক্রমে আসলেন বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, এছাড়াও আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু ও বাণী রায়ও নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রত্যেকের লেখায় প্রকটিত ছিল জীবন সংকট। শ্রেণিচেতনার গল্প ও উঠে এসেছে অনেকের লেখনী থেকে।

স্বাধীনতা নিয়ে ভারতবাসীর মনে যে স্বপ্ন, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ভঙ্গের সেই যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। দেশভাগ ও জাতিদাঙ্গা মানুষের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, স্বাধীনতা পরবর্তী অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সেই ক্ষতের নিরাময়ের বদলে তাকে করে তুলেছিল আরও দগদগে। বিমল করের সম্পাদিত পঞ্চাশের

দশকের গল্পকারদের নিয়ে যে গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তাতে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের বিধ্বস্ত রূপটি ধরা দিল বার বার।

১৯৪৮ সালে 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় কমলকুমার মজুমদারের 'জল' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পটিতে লেখক বীভৎস, রূঢ় বাস্তবকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যা আমাদের একই সঙ্গে শিহরিত ও মোহাবিষ্ট করে তুলে। এই কৃতিত্ব লেখকের নিজস্ব শিল্পী সত্তার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কমলকুমার মজুমদারের গল্পে বাস্তবতা শুধু আবহমন্ডলেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সঙ্গে মিশে আছে রক্তমাংসের মানুষ এবং তাদের ক্ষুধা তৃষণা না মেটার যন্ত্রণা। সমগ্র পঞ্চাশের দশক জুড়ে তিনি প্রায় দশটি ছোটগল্প লিখেছেন। প্রতিটি গল্পে বাস্তব যেন ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র ও নতুন পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছে। এ-ও এক নতুন গতিপথের ইঙ্গিত।পঞ্চাশের দশকের নতুন প্রজন্মের বেশ কয়েকজন ছোটগল্পকারদের অনুপ্রেরণা ছিলেন এই কমলকুমার মজুমদার। তাঁর দৃষ্টি ও ভাষা দুটোই স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। লেখকের 'নিম অন্নপূর্ণা' সংকলন ও 'সুহাসিনীর পমেটম' গল্পের জুড়ি মেলা ভার।

বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাসি কান্না, আশা আকাঙক্ষা ও ব্যথা বেদনার সফল রূপশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আপাত বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত জীবনের গহনে লুকিয়ে থাকা মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে তিনি তাঁর নিপুণ কলমে অনাবৃত করেছেন।

'দোলা' গল্পটিতে লেখক নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের এমন একটি ছবি অঙ্কিত করেছেন, যা সহজেই পাঠক-মনকে নাড়া দেয়। এক দুঃস্থ পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে গল্পের নায়ক অতুল এক বিধবা ও তার চারটি অবিবাহিতা কন্যার দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিল। বিধবার ঐকান্তিক অনুরোধে কর্তব্যনিষ্ঠ অতুল বড়মেয়ে শান্তিকে বিয়ে করে।এ বিয়ে প্রেমের নয়, কর্তব্যবোধের। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিয়েটা টিকলো না। অকৃতজ্ঞ শান্তি স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে গেল অন্য একটি ছেলের সঙ্গে। পলাতকা স্ত্রীর অপকর্মের দায়ভার বহন করতে অতুলকে পালিয়ে বেড়াতে হত লোকসমাজ থেকে। একবার ভেবেছিল সব ছেড়ে ছুঁড়ে দূরে কোথাও চলে যাবে; কিন্তু শাশুড়ীর কান্না তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। অতুল চলে গেলে বিধবা ও তার তিন অবিবাহিতা কন্যার অন্ন সংস্থান হবে কী করে? আবারও কর্তব্যবোধ অতুলের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালো। বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর মা ও বোনের অন্নসংস্থানের দায় বহন করতে অতুল সেখানেই বাধা পড়ে গেল। শান্তির তিন বোনের উপর আজ অতুলের অধিকার আছে, কিন্তু রুচির কোন মিল নেই। অতুলের সঙ্গে তাদের মেলে না। তাদের জীবন, রুচি এবং বন্ধু আলাদা। অতুলের অনুপস্থিতিতে তারা যেন আনন্দের স্রোতস্বিনী, কিন্তু অতুলের সামনে হিম শীতল বরফের স্তূপ। অতুল চায় না এই পরিবেশে দুর্ভাগ্য আর দুঃস্বপ্নের প্রতীক হয়ে থাকতে। কিন্তু এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন পথ সে খুঁজে পায় না।

এই গল্পের শেষে কোন সমাধান বা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেনি। এই দুঃসহ জীবন ধারণের শেষ কোথায় তারও কোন ইঙ্গিত নেই গল্পে। আবার লেখকের 'একটি প্রেমের গল্প'তে যৌবনে মিলনসুখে বঞ্চিত দুই তরুণ-তরুণী জীবনের শেষ বেলায় উপনীত হয়ে সব বাধা বিপত্তিকে জয় করে স্বামী স্ত্রীর স্বীকৃতি অর্জন করেছে। যদিও তার পরই নায়িকার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু নায়ক প্রতি বছর সেই মিলন তিথি উদযাপিত করে যান। এখানে প্রাপ্তি নেই, আছে প্রাপ্তিহীন এক পরিণতি।

উন্মাদনার বদলে দেখা মেলে শান্ত স্বীকৃতির। হৃদয়বৃত্তির রহস্য উদ্ঘাটনের এই শান্ত ভঙ্গীটি নতুন, একথা অস্বীকার করা যায় না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কলঙ্ক' গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। বিশ্বনাথ ও শর্বাণী এক বিবাহিত দম্পতি। বিশ্বনাথ যতটা উচ্ছৃঙ্খল, শর্বাণী ততটাই শান্ত। বিশ্বনাথের সমস্ত অপমান ও অনাচার সহ্য করেও সে স্ত্রী ধর্ম পালন করে গেছে, স্ত্রীর অধিকার সে ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে বিশ্বনাথ শর্বাণীকে অনুরোধ করলো বিয়েটা ভেঙে দিয়ে এই সম্পর্কের বাঁধন থেকে তাকে মুক্ত করতে, অন্যথায় সে আইনত দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করতে পারবে না।বিশ্বনাথ শর্বাণীকে ছেড়ে দিয়ে গ্রেসিকে বিয়ে করতে চায়। শর্বাণী আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আর জোর করে সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলো না। এখানেই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আধুনিকতার শুরু।

আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করা হল, আর শর্বাণী মেয়েকে নিয়ে আলাদা বাসায় চলে এল। এক বছর পর বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল। আদালতের নির্দেশে বিশ্বনাথ প্রতি মাসে একশ' পঁয়ত্রিশ টাকা করে খরপোষ পাঠায়। এভাবেই জীবন এগিয়ে চলছিল তার নিজস্ব গতি পথে।

হঠাৎ একদিন মা-মেয়ের সংসারে বিশ্বনাথ এল শর্বাণীর জন্য শাড়ি ও মেয়ে উর্মির জন্য জামা নিয়ে। সারাদিন খুব হৈ চৈ হলো, সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ারও নানা আয়োজন ছিল। গল্প গুজব ও খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পরও বিশ্বনাথ বসে রইলো। কনকনে শীতের রাত। সে শর্বাণীর সঙ্গে মিলন পিপাসু। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শর্বাণী কিন্তু তাতে রাজি নয়। তাই সে বিশ্বনাথকে স্পষ্ট স্বরে চলে যেতে বলে। বিশ্বনাথ শর্বাণীর কাছ থেকে এই প্রত্যাখ্যান আশা করেনি। তাই প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো। শর্বাণী আর বিশ্বনাথকে চায় না, শুধু তার পাঠানো টাকাটা হলেই চলবে, কেননা এই টাকাতে শর্বাণীর আইনত অধিকার আছে। সমস্ত রোমান্টিক ব্যাকুলতার মোহময় আবেদনকে ছাপিয়ে রূঢ় বাস্তব তার নিজস্ব স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। এই জীবন দৃষ্টিই আধুনিকতা।

ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা ও অপরিচয়ের অনুভূতি, সেইসঙ্গে আত্ম অন্বেষণের যে ব্যাকুলতা সাম্প্রতিক আধুনিক কথা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পলাতকা' গল্পে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভুলভাবে ধরা দিয়েছে। ত্রিকোণ প্রেমের ফ্রেমে আঁটা এই গল্পে রমাকে কেন্দ্র করে বাসব ও কমল চরিত্রের দ্বান্দ্বিক জটিলতা ও রমার মৃত্যুতে এর অবসান গল্পটির মূল উপজীব্য।

বাংলা ছোটগল্প সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষতা সাধন করতে সফল হয়েছিল, এর একটি উদাহরণ মহাশ্বেতা দেবীর 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পটি।

মেদিনীপুরের পাখমারা সম্প্রদায়ের যাযাবর মেয়ে জটি ভালবেসে নিজেদের সমাজের বাইরে গিয়ে ঘর বেঁধেছিল উৎসব কান্দোরীর সঙ্গে। জটির কোলে এলো ছেলে সাধন। সাধন যখন খুব ছোট তখন একদিন ছোলাই মদ খেয়ে উৎসব মারা গেল। দিশেহারা জটি নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার পর অনেক ভেবে চিন্তে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চারপাশে একটা অলৌকিকতার বর্ম এঁটে দিল।

জটি হয়ে উঠলো জটি ঠাকুরণী। সারাদিন সে ঠাকুরণী সেজে থাকত। পূজো পেত, আর তাবিজ মাদুলী দিত। বিনিময়ে শুধু এক পালি চাল নিত। নিজে উপবাসী থেকে সাঁঝ সকালে এই চাল ছেলেকে রেঁধে খাওয়াত। সাঁজ আর সকালে সে ছিল সাধনের মা আর সমস্ত দিনটা ঠাকুরণী। দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে থাকতে একদিন জটি ঠাকুরণী মারা গেল। ছেলের বয়স তখন ত্রিশ, কিন্তু সে নির্বোধ। সাধন মাকে ভালবাসে, সেই সঙ্গে তপ্ত ভাতের প্রতি তার প্রবল আসক্তি। তাই ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধ করলেও শ্রাদ্ধের চাল সে কিছুতেই পুরুত মশাইকে দিল না। শ্রাদ্ধের এক পালি চাল গামছায় বেঁধে সাধন বাড়ি ফিরে এলো।

''বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাধবে। ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে সাঁঝ সকালের মা বাঁধা থাকবে। মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের উপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।''[১২]

ভাতের প্রতি প্রবল আসক্তি আর মায়ের প্রতি ভালবাসা এই দুয়ে মিলে সাধন সম্পূর্ণ। গরম ভাতের মধ্য দিয়ে সাধন বার বার তার মাকে খুঁজে পায়। জৈবিক ক্ষুধা আর মায়ের প্রতি ভালবাসাকে লেখক এখানে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে অকপট বাস্তবকে সার্থক শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

পঞ্চাশের দশকের লেখকরা মধ্যবিত্ত মানসের বহুবিধ ব্যক্তি সংকটকে রূপ দিলে ও তার মূল ধারাটি সামাজিক বিন্যাসের ভিত্তিতেই নিহিত। এই দশকের গল্পের কেন্দ্রীয় অবলম্বন ছিল বাস্তবতার বৈচিত্র্যময়তা। ষাটের দশকে আমরা দেখতে পাই সমাজ বাস্তবতার ভিত্তিটি ক্রমশ তীক্ষ্ণ তরঙ্গাঘাতে বেসামাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু গল্প লেখকরা অনুসন্ধান করে চলেছেন আপাত অবাস্তব এক আত্ম অনুভাবনাময়, বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত মধ্যবিত্তের জগৎ। কারণ ষাটের দশকের মধ্যভাগে আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল।

১৯৬২-তে চীন ও ১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ায় ভারতকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল প্রতিরক্ষা খাতে। আমরা জানি ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু অবহেলিত কৃষি ও ক্রম বর্ধিত জনসংধ্যার কারণে দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দিল। এই ক্রমবর্ধিত জন সংখ্যার মূল কারণ ছিল প্রব্রজন। দুর্বল খাদ্য পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। ১৯৬৪-তে রীতিমত বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে শুরু হল হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন। এই খাদ্য আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ রূপ নিল চুড়ান্তভাবে। ষাটের দশকের বাংলা ছোটগল্পের জগৎও আলোড়িত হয়ে উঠলো এই আন্দোলনে।

অন্যদিকে শিল্পায়ণের ফলে দ্রুত পুঁজির বিকাশ ঘটতে লাগলো। শিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়ে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন এবং বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক ভোগ্যপণ্যময় জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা হল। এই পণ্যধর্মী সাহিত্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে। এই পণ্যধর্মী জনপ্রিয় গল্প ধারার মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্প আবারও এক নতুন বাঁক নিল। শুরু হলো বাংলা ছোটগল্পের এক নবতর অধ্যায়।

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার বিস্তার, বিভিন্ন মিডিয়ার প্রসার এবং বাণিজ্যিক লাভের জন্য যে কোন বস্তুকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার এক প্রবল প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় সেই সময়কার পুঁজিবাদীদের মধ্যে। তাই প্রকাশনা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাহিত্যকে বাণিজ্যিক লাভের আধার রূপে ব্যবহার করতে শুরু করলো। অর্থাৎ সাহিত্যে জনগণের মনোরঞ্জনই প্রধান হয়ে উঠলো। এই ধারার গল্প সমূহকে বলা হয় 'পপুলার ধারা'র গল্প। সময় এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধ এবং রুচিরও পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ধারাটি আজও অব্যাহত।

পাঠকের মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি রেখে গল্প লেখার প্রবণতা বরাবরই লক্ষ্য করা যায় লেখকদের মধ্যে। তবে ষাটের দশকের সঙ্গে পার্থক্য এখানেই যে, আগে লেখকরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য গল্পের প্রতিবেদন তৈরি করতেন এবং সেই গল্পগুলি প্রকাশিত হত যে কোন পত্রিকায়। কিন্তু ষাটের দশকে দেখা গেল মুনাফা সচেতন এক শ্রেণীর পত্রিকা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক বিশেষ শ্রেণির পাঠকের ভাল লাগার কথা মনে রেখে, সুপরিকল্পিতভাবে গল্প নির্মাণ করতে চাইছে; উদ্দেশ্য পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ফলে পুঁজিবাদী পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রকাশকরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে খানিকটা হলেও লেখক সাহিত্যিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। তবে এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের যুগে কিছু কিছু সাহিত্যিক আছেন যাদের কাছে আজও পণ্য ও পুঁজি শেষ কথা নয়। প্রগতিশীল মানসিকতা নিয়ে এরা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় দায়বদ্ধ।

পপুলার ধারার অত্যন্ত সফল কথা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, দিব্যেন্দু পালিত, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ। পরবর্তীতে এসেছেন বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্যর মত লেখকরা। শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষায় সহজ, সরল অন্তরঙ্গভাবে বহু হৃদয়স্পর্শী স্মরণীয় গল্প উপহার দিয়েছেন এরা প্রত্যেকেই।

ষাটের দশকে পশ্চিম বাংলার এক অন্যতম ঘটনা হলো নকশালবাড়ি আন্দোলন। এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলার প্রায় সর্বস্তরের মানুষের চেতনায়, আলোড়িত করেছিল সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য সম্পর্কে। এই আন্দোলনের ফলে লেখক, পাঠক ও সাধারণ জনগণ সমাজের নিম্নবর্গীয়দের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন, তাদের কথা নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। ফলে নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা যায় তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে। এই আন্দোলনের পরেই এসেছে বাংলা ছোটগল্পে এক নবতর পর্যায়। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ফলে প্রচন্ডভাবে ঝাঁকুনি খেল মধ্যবিত্ত সমাজ, যে সমাজ থেকে সাধারণত উঠে আসেন লেখকরা। তাই এই বিপন্ন সমাজ মনস্কতা লক্ষ্য করা যায় ষাট ও সত্তরের সমস্ত দশক জুড়ে। এই জটিল পরিস্থিতি বাংলা ছোটগল্পকে দাঁড় করিয়ে দিল এক প্রত্যক্ষ বাস্তবের মাঝখানে, ছোটগল্পকাররা আন্তরিকভাবে নিজেদের বিশ্বাসের সততা ও অভিমত ঢেলে দিলেন। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব মুক্ত হতে পারেননি সেই সময়কার বেশিরভাগ লেখকই।

সত্তরের প্রায় সমস্ত দশক জুড়েই এই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে এই দশকের বেশিরভাগ লেখকদের লেখায় অনেকক্ষেত্রে নৈরাশ্যের সুরই প্রধান হয়ে উঠে। সেই

সময়কার ছোটগল্পে মধ্যবিত্তদের জীবন আলখ্যের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী উপজাতি, দিন মজুর, ভিক্ষুক এবং দু'মুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া, খেটে খাওয়া অবহেলিত অন্তেবাসীদের জীবন দর্শনও স্থান পেলো সহমর্মিতার সঙ্গে। ফলে গল্পহীন গল্পের বদলে আবার ফিরে এল গল্প। সহজ, সরল, বিবৃতিময় ভঙ্গীতে অন্তেবাসীদের দুঃখ দুর্দশা, শোষণ-পীড়ন ও জীবন সংগ্রামকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে গল্পের চরিত্র হয়ে উঠলো স্বাভাবিক ও জীবন্ত। এই দশকের গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য বাস্তবতাতেই নিহিত। আসলে প্রতিটি সার্থক গল্পই মানুষের গল্প, সময়ের গল্প।

কিছু কিছু গল্পকার যারা প্রায় এক বা দুই দশক আগেই তাদের যাত্রা শুরু করেছিলেন, এই দশকে এসে তাদের কারো কারো গল্পের ধারা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বদলে গেছে। এই প্রসঙ্গে কমলকুমার মজুমদারের নাম করা যেতে পারে। তাঁর 'লুপ্ত পূজাবিধি' এবং 'বাগান কেয়ারি' ভারতের দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনশ্রেণি, শিশু মৃত্যু এবং জঙ্গলে কাঠ কাটা দিন মজুরকে নিয়ে লেখা, যা সত্তরের দশকের সময়োপযোগী সৃষ্টি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' এই দশকের একটি স্মরণীয় গল্প। অনাহারক্লিষ্ট, অভাবজীর্ণ মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও ক্ষুধার আর্তি-যে ক্ষুধা শেষ পর্যন্ত সম্পর্কের সব বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকারে। এখানেই গল্পটির কেন্দ্রীয় তাৎপর্য নিহিত।

সমরেশ বসু বরাবরই বাস্তবমুখী লেখক। তবুও এই দশকে লেখা তাঁর 'মাসের প্রথম রবিবার' অথবা 'পেলে লেগে যা' গল্পে সেই বাস্তব আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর স্থাপত্য শিল্পে বহু প্রান্তিক গ্রামাঞ্চল, মধ্যবিত্ত জীবন ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন, আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, বঞ্চনা ও রিক্ততার শিল্প সফল প্রতিবেদন তৈরি করার কাজে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির গভীরতা দিয়ে সমাজের প্রতিটি স্তরের বিশেষ করে অন্ত্যজশ্রেণির খোলসহীন কঠোর, নির্মম জীবন সত্য তথা শোষণ পীড়নের চিরায়ত দলিলকে শিল্পিত করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর সত্তরের দশকে লেখা গল্পে উঠে এসেছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও বিপ্লব দমনে পুলিশি অত্যাচারের ছবি, সর্বহারা মানুষের শোষণ ও বঞ্চনা, যে বঞ্চনার শিকার হয়ে তারা ধীরে ধীরে তলিয়ে গেছে উত্তরণহীন অন্ধকারের অতল গহ্বরে। আবার নিঃস্বজনের ধীরে ধীরে সচেতন ও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াটিকেও তিনি তাঁর গল্পে বাস্তবায়িত করেছেন। ধর্ম কীভাবে শোষণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে ধর্মের নামে প্রতারণা, আদিবাসী ও অন্তেবাসীদের প্রতি শোষণ ও অবিচার, বিজ্ঞানের প্রতি অনাস্থা ও অজ্ঞতা এইসব বাস্তবভিত্তিক বহুমুখী উপাদানের সমন্বয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। তাঁর 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'মাদার ইন্ডিয়া', 'বেহুলা' প্রভৃতি আরও অসংখ্য গল্পে এই বহুমুখী সমাজবাস্তবতার নগ্ন রূপ ফুটে উঠেছে। সমকালীন জীবন চিরকালীন হয়ে বিধৃত রয়েছে তাঁর গল্পে।

বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধীরে ধীরে বাংলা ছোটগল্পের ভূগোল বিস্তৃত হতে শুরু করলো। উত্তর বঙ্গ থেকে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মানুষ, খেটে খাওয়া বিত্তহীন শ্রেণি নিজেদের পরিসর খুঁজে পেলেন আধুনিক

ছোটগল্পের সীমিত গন্ডীর বিচিত্র রূপরেখায়। অভিজিৎ সেন তাঁর গল্পে তুলে আনলেন উত্তরবঙ্গের মাটির মানুষকে।

দেবেশ রায়ের গল্পে মধ্যবিত্ত এবং রিক্ত জনগোষ্ঠী উভয়েই স্থান পেয়েছে। গ্রাম বাংলার, বিশেষ করে উত্তর বাংলার নিঃস্ব মানুষকে যে অবিকল্প, অন্তর্গূঢ় সত্যতায় দেবেশ রায় রূপায়িত করেছেন, সেই দৃষ্টি তিনি অর্জন করেছেন অনেকটাই রাজনৈতিক আলোড়নের অভিঘাতের মধ্য দিয়ে। স্থানীয় দরিদ্র মানুষকে যারা খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তারাই স্পর্শ করতে পারেন সেই জীবন সত্যকে।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যাত্রা শুরু করেও যেসব নক্ষত্রদের আলোয় সত্তর আশির দশকেও বাংলা গল্পের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেইসব গল্পকারদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, মতি নন্দী প্রমুখরা অন্যতম। এঁদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার অফুরান। তাই এদের প্রত্যেকের গল্পবিশ্ব ও গল্পবীক্ষায় দেখা যায় অপরিমেয় প্রাচুর্যের সংকেত। জীবনের নানা জটিলতা, অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, নর-নারীর সম্পর্কের অন্তর্গূঢ়তা, জীবনের নানা রূপ রস গন্ধ, লোভ, হিংসা, নগ্নতা প্রভৃতি প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে নিজস্ব রুচি, উপলব্ধির গভীরতা এবং আত্মবিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় গড়ে তুলেছেন গল্পের নিজস্ব প্রতিবেদন। প্রত্যেকের দ্রষ্টা চক্ষুতে উদ্ভাসিত হয়েছে গভীর গোপন।

ছোটগল্পের প্রখ্যাত শিল্পী বিমল কর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন-

"অনেক লেখক আছেন যাঁরা গল্পের গঠনে অত্যন্ত দক্ষ, যতটা পারেন সাবেকি রীতিনীতি মেনে গল্প লেখেন, লেখার মধ্যে একটা ঝকঝকে ভাব থাকে, হয়তো খানিকটা নাটকীয়তা। অতীনের লেখার ধরণটাই আলাদা। তার কোনও নির্দিষ্ট ছক নেই, মাপজোক করে হিসেব মিলিয়ে গল্প লেখার ধাত তাঁর নয়। প্রায় সব লেখাই স্বতঃস্ফূর্ত, ভেতরের তাগিদেই নিজের মতন করে গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও সময় মনে হয়, অতীন বুঝি গল্পের পটুয়া। নিজের মতন করে আঁকেন, নিজের মতন পছন্দসই রং ব্যবহার করেন-যার উজ্জ্বলতা প্রখর নয় অথচ স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়। আর বলা বাহুল্য এর একটা দেশজ রূপ ও আকর্ষণ রয়েছে।"[১৩]

আশির দশকে বেশ কয়েকজন নবীন শক্তিমান ছোটগল্পকার নিজেদের বিচিত্রতর নির্মাণশিল্প নিয়ে গল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যেমন-আবুল বাশার, আফসার আহমেদ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বাণী বসু প্রমুখরা। আবুল বাশারের গল্পে রূপায়িত মুসলমান জনগোষ্ঠী তাদের প্রকৃত শেকড়সুদ্ধ রূপ নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আবুল বাশারের আগেও অনেক লেখকের গল্পে মুসলমান জনশ্রেণি উঠে এসেছে, কিন্তু আবুল বাশার নিজে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁর গল্পে রূপায়িত মুসলমান সমাজ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্রতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব শিল্পী সত্তার মৌলিকতা তাঁকে এক অন্যতম গল্পকার রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

সমাজ বাস্তবতার রূপকার রূপে সুচিত্রা ভট্টাচার্যর আবির্ভাব ঘটে ছোটগল্পের জগতে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সামাজিক সংকট তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গল্পে রূপায়িত করেছেন। বৃদ্ধাশ্রম নিবাসী পরিবার বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধদের হৃদয় বিদারক একাকিত্ব নিয়ে লেখা 'প্রতীক্ষালয়' গল্পটি বিষয় এবং রচনা নৈপুণ্যে এক মর্মস্পর্শী স্মরণীয় ছোটগল্প হয়ে উঠেছে।

সমকালীন সময়ের নিষ্ঠুর বাস্তবতার দর্পণ হয়ে উঠেছে বাণী বসুর ছোটগল্প। তাঁর গল্পগুলি গভীর সমাজ দৃষ্টি সম্পন্ন এবং গাঢ় ব্যঞ্জনাময়। পরবর্তীতে আরও অনেক সার্থক ছোটগল্পকার আবিভূর্ত হয়েছেন ছোটগল্পের বিশ্বভুবনে। সে যাত্রা আজও অব্যাহত। তাই রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক পদচারণা শুরু হলেও রবীন্দ্রনাথেই বাংলা ছোটগল্পের চরম সিদ্ধি একথা বলা যায় না।

সাম্প্রতিক ছোটগল্প সম্পর্কে 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য।

"সাম্প্রতিক ছোটগল্পে ব্যক্তিজীবনের যে সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে, উহার রক্তস্রাবী অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে তুচ্ছতম খেয়াল ও লঘুতম কল্পনাবিলাস পর্যন্ত অন্তর্জীবনের প্রতিটি অনুভূতির কম্পন যে সুস্পষ্ট রেখাচিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহার পরিকল্পনা ও বিষয় উপস্থাপনার দিক দিয়া যে অভাবনীয় বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে তাহাতেই উহার অগ্রগতির পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালা এই ব্যক্তিত্ব উপচিত মানবিক রসে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"[১৪]

সময়ের অবিসংবাদী অভিঘাতে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, নতুন জীবন দৃষ্টি ও উচ্চাবচতাময় জীবনের নানা বিচিত্র উপকরণের অভিনব ব্যবহার বাঙালি মনের সাহিত্য সৃষ্টির অভিযানে ছোটগল্পের ক্রমবর্ধিত প্রসার ও বৈচিত্র্য নবনির্মিতির দ্বার উন্মোচিত করে প্রবহমান জীবনস্রোতের সঙ্গে সময়ের সত্যকে অন্বেষণ ও পরখ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। আর সেই সঙ্গে ক্রমাগত নিজের প্রকাশ প্রকরণকে পাল্টে নিচ্ছে। জীবন যখন ক্রমাগত সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন জীবনবোধ ও সাহিত্যবোধ কোন অবস্থাতেই একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত থাকতে পারে না। সামাজিক পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিনিয়ত রূপান্তর ঘটে গল্পকার সত্তার, তাঁর সৃজন কৌশলের ও উপস্থাপন প্রক্রিয়ার; সেই সঙ্গে বিষয় বৈচিত্র্য ও অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধিরও। কালের যাত্রা পথে ছোটগল্প ধীরে ধীরে অবিনশ্বর অবয়ব নিয়ে নক্ষত্রখচিত সাহিত্যের আকাশে সময়ের দর্পণরূপে ধ্রুবতারার মত জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠছে।

সূত্রনির্দেশ-

১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা', ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৮২, পৃঃ ৯

২. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা-৬, ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৫৮, ১৫৯

৩. চক্রবর্তী সুমিতা, 'ছোটগল্পের বিষয় আশয়', পুস্তক বিপণি, কল-৯, জুন ২০০৪, পৃঃ ১২

৪. 'কালের পুত্তলিকা', পৃঃ ৯
৫. 'সাহিত্যে ছোটগল্প', পৃঃ ২০৮
৬. 'সাহিত্যে ছোটগল্প', পৃঃ ২১৫
৭. 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পৃঃ ৩৭
৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮
৯. 'কালের পুত্তলিকা', পৃঃ ১৯৮
১০. চোধুরী ভাস্কর, 'ছোটগল্পের অন্দর মহল', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-৯, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩০
১১. 'কালের পুত্তলিকা', পৃঃ ৪৮৬
১২. দেবী মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ই-বুক, সাঁঝ-সকালের মা, পৃঃ ৮০
১৩. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'ছোটগল্পের সুলুক সন্ধান' (পূর্বার্ধ), দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, আগস্ট ২০১৭, পৃঃ ৩১৫
১৪. 'কালের পুত্তলিকা', পৃঃ ৫৩৪